১

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পরবর্তী ঘটনাবলী

ভূমিকা

১৯০৫-১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী ১৯১৯-১৯২২ সালের খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ-ভারতের দুটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা। উভয় ঘটনা ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন। এই প্রথম কোন রাজনৈতিক আন্দেলন ব্যাপক গণ ভিত্তি পায়। দুটি আন্দোলনই সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। তবে সংগত কারণেই প্রথমটি ছিল বাংলা ভিত্তিক। এ দুয়ের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হলো, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যা কার্যত হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনে পরিণত হয়। অথচ খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলন ঘটে। বলার অপেক্ষা রাখে না বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব অপরিসীম। ৩টি ভাগে এ ইউনিটে উভয় আন্দোলনের কারণ, বিস্তার, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, হিন্দু ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন, আন্দোলনের পরিণতি এবং এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

◆ পাঠ-১ বঙ্গভঙ্গের কারণ ও ফলাফল

◆ পাঠ-২ বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া

◆ পাঠ-৩ খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২)

পাঠ - ১

বঙ্গভঙ্গ: কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বঙ্গভঙ্গের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

বঙ্গভঙ্গ

বাংলা ও ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১) একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। কলকাতা ছিল এর রাজধানী। এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ। শাসন কার্যের সুবিধার্থে ব্রিটিশ সরকার বাংলা প্রেসিডেন্সির বিভক্তকরণের কথা চিন্তা করতে থাকে। উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন স্যার রাম্পফিল্ড ফুলার এবং স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনও বহুবার বিষয়টি আলোচনা করেন। অতঃপর ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। সৃষ্টি হয় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসামকে নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে' এক নতুন প্রদেশ এবং এর রাজধানী হয় ঢাকা। নতুন প্রদেশের আয়তন ছিল ১,০৬,৫০৪, বর্গমাইল। এর লোকসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ। জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান (১ কোটি ৮০ লক্ষ)।

বঙ্গভঙ্গের কারণ

বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রধান কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:

(১) শাসনতান্ত্রিক;
(২) রাজনৈতিক;
(৩) সামাজিক;
(৪) অর্থনৈতিক।

কারণগুলো নিচে পর্যালোচনা করা হল:

শাসনতান্ত্রিক কারণ

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অনুসারে সৃষ্ট "বাংলা প্রদেশ"-এর আয়তন ছিল প্রায় দুলক্ষ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল পৌনে আট কোটি। এ বিশাল প্রদেশের শাসনভার একজন গভর্নরের উপর ন্যস্ত ছিল। ফলে এর শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা দমন করা ছিল দুরূহ ব্যাপার।

তাই বাংলা প্রদেশকে বিভক্তকরণে ইংরেজ সরকার সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। অবশেষে লর্ড কার্জন বঙ্গ প্রদেশকে বিভক্ত করে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

রাজনৈতিক কারণ

বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার পেছনে ইংরেজ শাসকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল। এ ব্যাপারে, বিশেষ করে আমাদের এ দেশীয় লেখক, তথা ইতিহাসবিদগণ প্রায় একমত। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টাকে বানচাল করা।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় জনসাধারণের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম আন্দোলনের ধারাকে আরো বেশি বেগবান করে। এক্ষেত্রে বাংলা প্রদেশ ছিল অনেক অগ্রসর।

যে কারণে সুচতুর ইংরেজ সরকার তদানীন্তন বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বন্ধ করার জন্য নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করে।

ভাগ কর শাসন কর নীতি

বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের আন্দোলন বা দাবির ফসল ছিল না। পরবর্তীতে এর ঘোর সমর্থক ও প্রবর্তক ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ স্বয়ং নিজে শুরুতে এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন বা এর প্রতি তাঁর সমর্থনও ছিল না। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে আসে। কার্যত এটি ছিল ব্রিটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর নীতির' (Divide and Rule Policy) ফল। প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব বাংলার কয়েকটি বড় শহর ভ্রমণের সময় লর্ড কার্জন যে ভাষণ দেন তা ছিল এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাই বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ ছিল ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ফসল।

সামাজিক কারণ

ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য হারাতে থাকে। ফলে ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব জোরালোভাবে সমর্থন করে।

অর্থনৈতিক কারণ

কলকাতা ভিত্তিক সকল ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকায় এবং শিল্প কারখানা তৈরি হওয়ায় বঙ্গ প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ তথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী অঞ্চলের জনসাধারণ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিকভাবে কলকাতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কলকাতা ছিল মূলত হিন্দু সম্প্রদায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যার কারণে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। এ বৈষম্যের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের লক্ষ্যে মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে। এবং ঢাকা কেন্দ্রীক বিকাশের স্বপ্ন দেখতে থাকে।

বস্তুত ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বরে লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলা প্রদেশ বিভক্তিকরণ বা বঙ্গভঙ্গের মূলে শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

নতুন প্রদেশ সৃষ্টির ফলে মুসলিম সমাজের মধ্যে যেনো প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আসে। আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে প্রদেশের রাজধানী ঢাকায়। অনেক কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় এলিট মুসলমান সমাজ ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত করে। এ মুসলিম লীগের মাধ্যমেই পরবর্তীতে জন্ম নেয় উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিট সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গকে সঠিকভাবে মেনে নিতে পারে নি। তারা আশঙ্কা করলেন মুসলমান সমাজের ওপর তাদের আধিপত্য হারানোর এবং তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতির। ফলে, ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্য সার্থক হয় এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তারা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মিলিত জাতীয়তাবাদী শক্তি শুরুতেই দুর্বল হয়ে যায়।

সারকথা

১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাকে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন। পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়। ঢাকা ছিল এর রাজধানী। পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর নিয়ে গঠিত হয় অপর প্রদেশ। কলকাতা ছিল এর রাজধানী। বঙ্গভঙ্গের কারণগুলোকে শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এ ভাবে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বা প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাজের সুবিধা এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ধর্মনির্বিশেষে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের সম্ভাবনা বানচাল –এ দুটিই ছিল ব্রিটিশদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নতুন প্রদেশ 'পূর্ব বাংলা ও আসাম'-এর প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ উচ্চবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় তাদের উন্নতি-অগ্রগতির একটি স্থায়ী সুযোগ হিসেবে দেখে। তাই তারা একে স্বাগত জানায়। পক্ষান্তরে নানা কারণে হিন্দু সম্প্রদায় এর উচ্চবিত্ত

অংশ একে মেনে নিতে পারে নি। তারা এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয় এবং ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যহত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. বঙ্গভঙ্গ কত সালে হয়?
   ক. ১৯০৪ সালে
   খ. ১৯০৬ সালে
   গ. ১৯০৫ সালে
   ঘ. ১৯১১ সালে

২. কত তারিখ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের সৃষ্টি হয়?
   ক. ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর
   খ. ১৯০৫ সালের ১লা জুলাই
   গ. ১৯০৫ সালের ১লা আগস্ট
   ঘ. ১৯০৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর

৩. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী কোথায় ছিল?
   ক. ঢাকায়
   খ. সোনারগাঁয়ে
   গ. কলকাতায়
   ঘ. জাহাঙ্গীরনগরে

৪. কে বঙ্গ ভঙ্গের ঘোষণা দেন?
   ক. লর্ড কার্জন
   খ. লর্ড হলওয়েল
   গ. উইলিয়াম হান্টার
   ঘ. স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার

৫. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের আয়তন কত ছিল?
   ক. প্রায় ২,০০,০০০ বর্গ মাইল
   খ. ১,০৬,৫০৪ মর্গমাইল
   গ. ১,৪১,৫৮০ বর্গমাইল
   ঘ. ১,১৫,১২৬ বর্গমাইল

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. ক, ৪. ক, ৫. খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বঙ্গভঙ্গের পটভূমি আলোচনা করুন।
২. বঙ্গভঙ্গের ফলাফল কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বঙ্গভঙ্গের কারণগুলো আলোচনা করুন।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলায় অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে। লর্ড কার্জন ঢাকাকে প্রশাসনিক কেন্দ্র ঘোষণা করেন এবং স্যার ফুলারকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী সময়ে নতুন প্রদেশে হাইকোর্ট ভবন, আইন পরিষদ ভবন ইত্যাদি গড়ে উঠে। সঙ্গত কারণেই পূর্ব বাংলার জনসাধারণের এলিট অংশ তাদের বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক দাবি পূরণে সক্ষম হয়। বঙ্গভঙ্গ উচ্চবিত্ত হিন্দু কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত হানে। শুরু হয় তাদের পক্ষ থেকে এর চরম বিরোধিতা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এক ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। তারা বাংলা প্রদেশের বিভক্তিকরণকে মাতৃভূমির অঙ্গছেদ বলে আখ্যায়িত করেন। এদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, শ্রী বিপীন চন্দ্র পাল, দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের বাংলা প্রদেশের বিভক্তিকরণকে অযৌক্তিক ও অপমানকর বলে মন্তব্য করেন। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার এবং বিদেশি পণ্য বর্জন শুরু হয়। সমগ্র বাংলা ও বাংলার বাইরে চলতে থাকে জনসমাবেশ এবং প্রতিবাদ সভা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অচল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে আন্দোলন সহিংসরূপ নেয়। এ সময় কংগ্রেস নেতৃবর্গও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। যার ফলে আন্দোলন আরো তীব্র হয়। আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার নত হতে বাধ্য হয়। অতঃপর ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকে দিল্লির দরবারে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রাক্কালে ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশ এবং পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ইত্যাদি অচল হয়ে পড়ে। ফলে ব্রিটিশ সরকার এ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। যদিও পূর্বে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করছিল যে, বঙ্গভঙ্গ একটি 'স্থায়ী ব্যবস্থা' এবং কোন চাপের মুখে তা রদবদল করা হবে না। বঙ্গভঙ্গ রদকে এলিট মুসলমান সম্প্রদায় এই ঘোষণার বরখেলাপ মনে করে।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল

আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার পুনরায় বাংলা প্রদেশ গঠন করে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ দিকে আসামকে পূর্ব বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্বের ন্যায় পৃথক শাসনাধীনে নিয়ে আসা হয়। বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর (যা পূর্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল) নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে রদ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে একটি বিভক্তি রেখা রয়ে যায়। পূর্ব বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ সচেতন হয় এবং অধিক সংগঠিত হওয়ার কথা উপলব্ধি করে। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়।

সারকথা

বঙ্গভঙ্গকে হিন্দু সম্প্রদায়সহ মুসলমানদের সচেতন অংশ মাতৃভূমির অনুচ্ছেদ হিসেবে মনে করেছিলেন। উপরন্তু বঙ্গভঙ্গ কলকাতা ভিত্তিক হিন্দু জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর কায়েমীস্বার্থে কুঠারাঘাত হানে। ফলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অরবিন্দ ঘোষ, বিপীন চন্দ্র পাল প্রমুখের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তা স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বদেশী পণ্য ব্যবহার এবং বিদেশি পণ্য বর্জন ছিল এর মূল কথা। আন্দোলনের চাপে বেসামাল হয়ে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমান এলিট সম্প্রদায় এই ঘোষণাকে তাদের নিকট দেয়া ব্রিটিশ সরকারের অঙ্গিকারের বরখেলাপ বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতি আস্থাহীনতা দেখা দেয়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা পুনরায় একই প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিযুক্ত করে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. কতসালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হয়?
   - ক. ১৯০৫ সালে
   - খ. ১৯০৬ সালে
   - গ. ১৯১৩ সালে
   - ঘ. ১৯১১ সালে

২. পঞ্চম জর্জের অভিষেক কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?
   - ক. ঢাকায়
   - খ. কলকাতায়
   - গ. দিল্লিতে
   - ঘ. বেনারসে

৩. কে ঢাকাকে প্রশাসনিক কেন্দ্র ঘোষণা করেন?
   - ক. ব্রিটিশ সরকার
   - খ. গভর্নর স্যার রামফিল্ড ফুলার
   - গ. লর্ড কার্জন
   - ঘ. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

৪. বঙ্গভঙ্গের পর কাকে নতুন প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়?
   - ক. উইলিয়াম হান্টার
   - খ. মাউন্টব্যাটেন
   - গ. স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার
   - ঘ. স্যার রামফিল্ড ফুলার

উত্তরমালাঃ ১. ঘ, ২. গ, ৩. ক, ৪. ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বঙ্গভঙ্গ রদের মূল কারণগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২)

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি—
- ◆ খিলাফত আন্দোলন ও এর কারণ এবং ফলাফল সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি ও গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

খিলাফত আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর তুরস্কের অখন্ডত্ব রক্ষা এবং তুর্কী সুলতান বা খলিফার মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটেনের তথা মিত্রশক্তির বিপরীতে জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ঘটে এবং তুর্কী সম্রাজ্যের অখন্ডত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। ভারতের মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানকে বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের খলিফা বা নেতা বলে মনে করতো। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের এই মর্মে আশ্বাস দেয় যে, যুদ্ধ শেষে তুর্কী খলিফার খিলাফত বা সাম্রাজ্যের অখন্ডত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। ফলে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দিয়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার পূর্বের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে খন্ডবিখন্ড করতে উদ্যত হলে ভারতের মুসলমানরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

খিলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপঃ
১. তুর্কী সাম্রাজ্যের অখন্ডত্ব বজায় রাখতে হবে। খিলাফত ভেঙে দেওয়া যাবে না।
২. ইসলাম ধর্মের স্বার্থ রক্ষার্থে খলিফার হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকতে হবে।
৩. কোন প্রকার অছি বা প্রটেকশন ছাড়াই আরব দ্বীপের উপর মুসলমানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।
৪. খলিফার হাতে পবিত্র স্থানগুলোর তদারকির ভার ন্যস্ত থাকতে হবে।

তুর্কী সাম্রাজ্যের অখন্ডত্ব এবং সুলতানের খিলাফত বা রাজত্ব বহাল রাখার প্রশ্নটি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌র ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগের বিষয়ে পরিণত হয়। যে কারণে ভারতবর্ষের মুসলমানরাও এক্ষেত্রে মনে-প্রাণে একাগ্রতা অনুভব করে। ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তারা স্বতস্ফূর্তভাবে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান শুরু করে। দেশের সর্বত্র স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অসংখ্য খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ১৯১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় খিলাফতের সমর্থনে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন এ.কে.ফজলুল হক, বর্ধমানের আবুল কাশেম, 'মুসলমান' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক মজিবুর রহমান, এডভোকেট নাজিমুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ। বাংলায় খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী), মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লিতে প্রথম সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান এবং মিত্রশক্তির বিজয়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সমগ্র ভারতব্যাপী 'শান্তি উৎসব' আয়োজনের বিরোধিতা করে এ সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খিলাফত আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন এবং খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গান্ধীর ব্রিটিশ বিরোধী 'বয়কট কর্মসূচি' (বিস্তারিত পরবর্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) গ্রহণ আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে। খিলাফত আন্দোলন ছিল মূলত ভারতীয় মুসলমানদের একটি স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন। আন্দোলনের ইস্যু ছিল বহির্দেশীয় (তুর্কী খলিফার খিলাফত অক্ষুন্ন রাখা)। আন্দোলনকে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নিয়ে আসার চেষ্টা সত্ত্বেও এর সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়ে যায়। এ ধরনের একটি গণভিত্তিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা নেতৃবৃন্দের তেমন ছিল না। উপরন্তু গান্ধীর 'বয়কট' কর্মসূচি গ্রহণ করা নিয়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরম মতভেদ দেখা দেয়। ইসলামি

শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের নেতৃত্বের অংশটি এ কর্মসূচি গ্রহণের পক্ষে অবস্থান নেয়। অপরদিকে, জিন্নাহ, ফজলুল হক, সৈয়দ ওয়াজির হাসান, আবুল কাশেম প্রমুখ এ কর্মসূচিকে 'ধ্বংসাত্মক' আখ্যায়িত করে তা মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূলে হবে না বিধায় গ্রহণে অসম্মতি জানায় এবং আন্দোলন থেকে তাঁরা সরে দাঁড়ান। এ সব ছিল আন্দোলনের দুর্বল দিক। কিন্তু মজার বিষয় হলো ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল পাশা (কামাল আতাতুর্ক) তুরস্কের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে খিলাফতের অবসান ঘোষণা করেন। তুরস্ক পরিণত হয় একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রে। এরপর খিলাফত আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিঃশেষ হয়ে পড়ে।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৯ সালে ব্রিটিশদের দমন, নিপীড়ন মূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর আহবানে সমগ্র ভারতব্যাপী যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা-ই অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। এটি ছিল ভারতে প্রথম গণভিত্তি সম্পন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। খিলাফত ইস্যু যুক্ত হওয়ায় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় এতে যোগ দেয়। ফলে তা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের সম্মিলিত আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

যুদ্ধ শেষে দেশ শাসনে অধিকতর ক্ষমতা ও সুযোগ নিজেদের হাতে লাভের যে প্রত্যাশা ভারতীয়দের মধ্যে জন্মেছিল, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন তা পূরণে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে, একই সময় সংঘটিত দুটি ঘটনা তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। একটি রাউলাট আইন, এবং অপরটি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড। ১৯১৯ সালের শুরুর দিকে ব্রিটিশ সরকার প্রথমোক্ত আইনটি পাস করে। এ আইনে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাউকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনা বিচারে আটক করে রাখার বিধান করা হয়। এ আইনের বিরুদ্ধে যখন জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছিল তখন দ্বিতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে চতুর্দিকে প্রাচীর ঘেরা একটি মাঠে কয়েক হাজার মানুষ একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি ছুড়লে চার শ'র মতো লোক নিহত এবং অসংখ্য আহত হয়। ইতিহাসে এ ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্র্যাজেডী' বা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক হত্যাকান্ড' নামে অভিহিত। এ অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। একই সময় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তুরস্কের অখন্ডত্ব বজায় এবং খলিফার শাসন অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে খিলাফত আন্দোলন গড়ে তোলে।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে গান্ধী তাঁর 'বয়কট কর্মসূচি' পেশ করেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটির সম্মেলনে এ কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। একই বছর নভেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত যৌথ সম্মেলনে তা গৃহীত হয়। কর্মসূচির প্রধান দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. বিদেশি পণ্য বর্জন;
২. ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব ও পদবী বর্জন;
৩. অবৈতনিক পদগুলো ত্যাগ;
৪. সরকার পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন;
৫. আইনজীবীদের আদালত বর্জন;
৬. সরকারি কার্যক্রম বয়কট;
৭. কাউন্সিল (আইনসভা) নির্বাচনে অংশগুহণ না করা;
৮. সরকার মনোনীত ভারতীয় সদস্যদের আইনসভা থেকে পদত্যাগ;
৯. চরকায় সুতা কাটায় উৎসাহ দান;
১০. পঞ্চায়েত গড়ে তোলা এবং এ ব্যবস্থাকে সুসংহত করা;
১১. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা;
১২. সকল প্রকার অস্পৃশ্যতা দূর করা।

গান্ধীর 'বয়কট কর্মসূচি' জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব ও পদবী বর্জনের ঘোষণা প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় আসতে থাকে। সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্থলে ভারতীয়দের উদ্যোগে সারা দেশে রাতারাতি 'জাতীয় শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তাতে যোগ দেয়। আইনজীবীদের আদালত বর্জন সর্বাত্মকভাবে সফল হয়। বিদেশে পণ্য বর্জন ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিলেতী বস্ত্র ও জিনিসপত্র পোড়ানো যেন ব্রিটিশ শাসন ধ্বংসের প্রতীকে পরিণত হয়। চরকায় সুতা কাটার ব্যাপারেও জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা দেয়। সারা দেশে প্রায় ৪০ লক্ষ চরকা চালু হয়।

পারস্পরিক গ্রহণ-সমর্থনের কারণে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় শামিল হয় এবং তারা ব্রিটিশ বিরোধী এক দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একই স্থানে, একই প্যান্ডেলে সভা-সমাবেশ-সম্মেলনে মিলিত হন। আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তারসহ নানা নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯২১ সালের মে মাসে আসামে চা শ্রমিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। আন্দোলনের জের হিসেবে মোপলা চাষীদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানে উদ্বুদ্ধ করে।
গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ সহিংস রূপ লাভ করে। বিশেষকরে 'বয়কট কর্মসূচি' গ্রহণের পর থেকে দ্রুত আন্দোলনের রূপ ও চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর প্রদেশের চৌরি-চৌরা স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতা একটি পুলিশ স্টেশন আক্রমণ করে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে ২২জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

নানা কারণে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম।

১. এটি ছিল ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম গণভিত্তিক আন্দোলন।
২. এই প্রথম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়।
৩. দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নীতির সর্বপ্রথম প্রয়োগের সুযোগ লাভ করেন।
৪. ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়।
৫. জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের ব্যাপক সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটে।
৬. এ আন্দোলন ভারতবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে, যা পরবর্তী আন্দোলনকে প্রভাবান্বিত করে।
৭. মুসলমান নেতৃবৃন্দ আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

সারকথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) তুরস্ক ব্রিটেন তথা মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানির পক্ষ নেয়। যুদ্ধে তুরস্ক ও তার মিত্রদের পরাজয় ঘটে। যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যুদ্ধ শেষে ব্রিটেন তুর্কী খলিফার খিলাফত বা সাম্রাজ্যকে খন্ডবিখন্ড করতে উদ্যত হয়। ফলে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে তুর্কী সুলতান বা খলিফার মর্যাদাও কর্তৃত্ব রক্ষা এবং তুর্কী সম্রাজ্যের অখন্ডত্ব বজায় রাখার সমর্থনে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইতিহাসে তা খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। অপরদিকে যুদ্ধশেষে ভারতীয়দের হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করা হবে এ মর্মে তাদের মধ্যে বিপুল প্রত্যাশা জন্মেছিল। কিন্তু তা পূরণে ব্রিটিশ সরকার ব্যর্থ হয়। ফলে প্রায় একই সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন। বিদেশি পণ্য, ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব, সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আইন-আদালত বর্জনসহ একটি বিস্তারিত 'বয়কট কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কাঁধে কাঁধ রেখে আন্দোলনে শরিক হয়। ব্রিটিশ সরকার দমন-পীড়ন, গ্রেফতারের আশ্রয় নেয়। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল ব্রিটিশ সেনা সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড, যা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্রাজেডী' নামে অভিহিত। আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরি-চৌরা স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতা একটি পুলিশ স্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে ২২ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এরপর গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এর সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনও দ্রুত স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া তুরস্কে মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে খেলাফতের অবসান ঘটে এবং তুরস্ক একটি রাজতন্ত্র বিমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খিলাফত আন্দোলন কতো সালে গড়ে ওঠে?
   ক. ১৯০৫ সালে
   খ. ১৯১৪ সালে
   গ. ১৯২৪ সালে
   ঘ. ১৯১৯ সালে

২. কোন সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়?
   ক. ১৯১৮
   খ. ১৯১৯
   গ. ১৯২০
   ঘ. ১৯২১

৩. ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল কোন মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়?
   ক. চৌরি-চৌরায় ২২জন পুলিশের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ
   খ. জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্র্যাজেডী
   গ. কলকাতা দাঙ্গা
   ঘ. মোপলা বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ

৪. কোন সালে গান্ধীর 'বয়কট কর্মসূচি' গৃহীত হয়?
   ক. ১৯১৯ সালে
   খ. ১৯২০ সালে
   গ. ১৯২১ সালে
   ঘ. ১৯২২ সালে

৫. কখন গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন?
   ক. ১৯২০ সালে
   খ. ১৯২১ সালে
   গ. ১৯২২ সালে
   ঘ. ১৯২৪ সালে

উত্তরমালাঃ ১. ঘ, ২. খ, ৩. খ, ৪. খ, ৫. গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. খিলাফত আন্দোলন কী?
২. অসহযোগ আন্দোলন কী?
৩. অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি কী ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খিলাফত আন্দোলনের কারণ বা পটভূমি বর্ণনা করুন।
২. খিলাফত আন্দোলনের পরিণতি বা ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
৩. অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?